।। ২।।

যেভাবে দিন শুরু হতো

আগেই বলেছি আমার ভাই-বোনের কোন ঘাটতি নেই । সাত ছেলে-মেয়ে নিয়ে বাবা-মামা সাজিয়েছে তাদের সংসার । তখনকার দিনে জন্ম-পরিকল্পনা নিয়ে কোন জল্পনা-কল্পনা ছিল বলে মনে হয় না । ঘরে-ঘরে পাঁচ-ছজন করে দেখেছি । আমাদের মামা-চাচাদের ঘরেই তো পাঁচ-ছজন । যত সন্তান তত সহায়, এমন একটা পরিবেশে পারিবারগুলো বেড়ে উঠতো । খোদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঠাকুর পরিবারের নবম সন্তান ছিলেন ।

এখন অবশ্য সে সব পাল্টে গেছে । শহরের লোকেরা দুটো বেশি সন্তান নিতে অস্বস্তি বোধ করে । আর্থিক কারণের পাশাপাশি মায়েদের অধিক হারে কর্মজীবনে প্রবেশ, সার্বিক নিরাপত্তার বেহাল অবস্থা আর লোকজনের ব্যস্ততা, অধিক সন্তানে নিরুৎসাহিত করেছে ।

তবে সন্তান বেশি নিলেই যে সব সমস্যার হিল্লে হবে, তা ভাববার কোন কারণ নেই অন্তত বিংশ শতাব্দীতে সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ।

এই অধ্যায়ে আমাদের সামীবাগের বাড়িতে সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কি কি হতো, তার বর্ণনা দেবার চেস্টা করবো । সেটা ১৯৭৬ সাল । সবচেয়ে ভোরে উঠবেন আমাদের মা । ফজরের অনেক আগেই উঠে পড়বে তিনি । তারপর গুন-গুন করে খুদাকে ডাকতে থাকবেন । খুদাকে ডাকবার একটা মিষ্টি গান ছিল । মা সেটা গুন-গুন করে গাইতেন । গানটা এত সুমিষ্ট ছিল যে একবার শুনলে বার বার শুনতে ইচ্ছে হতো ।

খুদাকে যে এত মিষ্টি সুরে ডাকা যায়, মার গুন-গুনানি না শুনলে জানা হতো না । খুদা সম্পর্কে অনেক ধারণার মধ্যে একটি হলো, আমরা কোন অপরাধ করলে উনি আমাদের কেটে-কুটে সাবার করে দেবেন । তারপর সেই কাটা অংশ আগুনে পুরে ভর্তা করা হবে । তখন প্রশ্ন জাগে, যিনি মমতা দিয়ে মানুষ বানালেন, তারপর আত্মা ঢুকিয়ে দিলেন নিজের হাতে, সেই মনুষ্যকে কেটে-কুটে সাবাড় করে দেবেন, এ কেমন কথা ? উনার কি দিল একটুও কাঁপবে না? উত্তর হলো, খুদার দিল কাঁপবে এবং অবশ্যই কাঁপবে । আর সেখানেই আমাদের স্বস্তি ।

খোদাকে ডাকবার গানটা মা শিখেছিলেন আমার নানাজানের কাছে । আমার নানাভাই কোন বাউল ছিলেন না, না সঙ্গীতজ্ঞ । তিনি মারফতি গান লিখতেন এবং সুর দিতেন । রেডিও বা টেলিভিসনে তার গান কখনো বাজানো হয়নি তবে গানগুলো ছিল মিষ্টত্বে ভরা । উনার একটা গান আমি প্রায়ই গাই গুন-গুন করে ।

আজো দেখো হোমা পাখি আকাশেতে উড়েছে
হোমা ছায়া মাথে নিতে কত লোকে দৌড়েছে ।

আমরা সাত ভাই-বোনের একেক সময় ক্লাস থাকতো । বড় চার জনের ক্লাস ভোরের দিকে । ফলে সকালেই শুরু হতো হাঁক-ডাক আমাদের বাসায় কারণ বাড়ির গাড়ি সকাল সাড়ে-সাতটায় রওনা হবে । আমাদের তখন পুরোনো মডেলের ফিয়াট গাড়ি ছিল । সেই গাড়ি করে ওদেরকে নামিয়ে দিয়ে আসা হতো ।

মাকে দেখতাম রুটি বানাতে বসে গেছে । তাকে সাহায্য করছে নাজমা (নাজমা হলো একজন মহিলা সম্ভবত জামালপুর থেকে এসেছিল আমাদের বাসায়) । তখনকার জামানায় আবার রেডিমেড ব্রেড খুব একটা চালু ছিল না অন্তত আমাদের বাসায় সে সব দেখিনি । মাকে দেখতাম আটা গুলে রুটি বানাতে । তারপর গরম তাওয়ায় বিছিয়ে দেয়া হতো সেসব । রুটিটা যখন ফুলে ঢোল হতো, তখন নামিয়ে আনা হতো । মাঝে-মধ্যে আমি তাওয়ার উপরে রুটি বিছিয়ে দিতাম শুধু মাত্র ফুলে উঠে দেখবার জন্য । রুটিটা যখন ফুলে উঠতো, তখন শিকা দিয়ে ফুলে উঠা জায়গাটা ফুটো করে দিতাম । ফুর ফুর করে গরম হাওয়া বেরিয়ে আসতো । মা রাগ করতেন কিন্তু আমার পীড়াপিড়িতে মাঝে-মধ্যে আমাকে রুটি ফুটা করতে দিতে হতো ।

এভাবে একগাদা রুটি বানাতেন আমাদের মা । রীতিমত রুটির একটা স্তুপ তৈরি হয়ে যেত কারণ আমরা ছাড়াও কোন না কোন মেহমান থাকতোই আমাদের বাসায় । মেহমান ছাড়া খুব কম রাত্রি যাপন করেছি আমরা । আমাদের বাবা-মার মেহমান প্রীতি ছিল খুব আর সে সূত্র ধরে আত্মীয়-স্বজনদের নির্বিঘ্নে যাতায়াত ছিল । আত্মীয়-স্বজনদের কথা পরে আবারো লিখবো ।

একগাদা রুটি টেবিলে দিয়ে দিতেন আমাদের মা । সেই সাথে মুরগরি মাংস আর ডিম । এদিকে থাকতো বাটি ভর্তি দুধ আর চা-বিসকুট । ওরা চারজন তৈরি হয়ে খেতে বসে যেত । কিন্তু যে যা পারে খেয়ে যাবে, তা হবে না । মা গুনে-গুনে সবাইকে খাওয়াতেন যেন আধপেট খেয়ে কেউ উঠতে না পারে ।

মা এসব করতেন তার শুকনো হাত দিয়ে । সরু-সরু হাত দিয়ে মা খাওয়া বেড়ে দিতেন আর আমরা মজা করে সে সব খেতাম । মা তাগাদা দিতেন বেশি বেশি নিতে । এগুলো হলো অনেক আগের কথা । এরপর কত বছর পার হয়ে গেছে । আমাদের আম্মাও চলে গেছেন তার আলয়ে । এখন যদি কোথাও কোন শুকনো-বয়স্ক মহিলা দেখি, আমি দাঁড়িয়ে যাই । আমি দাঁড়িয়ে থাকি যতক্ষণ না উনি চলে যাচ্ছেন ।

বড় চারজন বেরিয়ে যাবার সাথে সাথেই বাড়িতে নেমে আসতো নীরবতা । একসাথে চারজন গেলে যা হয় । বির-বির করে দোয়া করতে থাকতো মা যেন তার ছেলে-মেয়েরা ঠিক ঠিক ফিরে আসে ।

সকাল সাড়ে-সাতটায় বাড়ির গাড়ি রওনা হতো । এদের কারো ক্লাস আটটায়, কারো নটায় । সামীবাগ থেকে বেরিয়ে মতিঝিলের ভেতর দিয়ে ইউনিভার্সিটিতে হাজির হতো গাড়ি । অবশ্য মাঝে-মধ্যে দেখতাম গুলিস্তান দিয়ে যেতে । এসব এজন্য জানি, মাঝে-মধ্যে আমিও চড়াও হতাম ওদের সাথে সকালের হাওয়া খেতে । তখনকার সকাল অন্য রকম ছিল । আলো-হাওয়ায় ভরা শিশিরের সকাল ।

© www.sayedhossain.com

ঢাকার রাস্তায় তখন ট্র্যাফিক-জ্যাম খুব কম দেখেছি । সামীবাগ থেকে গাড়ি হাঁকলে আধ-ঘন্টায় ইউনিভার্সিটি পৌছানো যেত । রাস্তায় পাশে তখন বড় বড় গাছ ছিল, যা শহরকে উত্তাপ থেকে রক্ষা করতো । পরে সে সব কেটে ফেলা হয়েছে । কেন সে সব কাটা হলো অথবা আদৌও এর প্রয়োজন ছিল কিনা, সেটা কেউ তলিয়ে দেখেছে বলে মনে হয় না ।

আজ কাউকে বিশ্বেস করানো যাবে না তখন মতিঝিলের রাস্তায় বড় বড় গাছ মাথা উচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো । ওরা মতিঝিলকে ছায়া দিয়ে রাখতো দিনভর । আমরা গাছের ছায়ায় মতিঝিলের রাস্তায় হাঁটতাম ।

সবার আগে আমার বড় বোনকে কার্জন হলে নামানো হতো । ও তখন শেষ বর্ষের ছাত্রী । বেরিয়ে যাবে যাবে করছে । ও নেমে গেলে গাড়ি হাজির হতো ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের চত্বরে । আমার বড় ভাই তখন ডাক্তারি পড়ে । সম্ভবত আরো বছর খানেক লাগবে পড়া শেষ করতে । বড় ভাই নেমে গেলে গাড়ি যেতো বুয়েটে মেজ ভাইকে নামাতে । মেজ ভাই তার লম্বা-লম্বা পা ফেলে সিভিল ইন্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের চত্বরে নেমে যেত । তারপর গাড়ি ছুটতো কলা ভবনের দিকে । যতদূর মনে পড়ে, বুয়েট থেকে বেরিয়ে ব্রিটিশ কাউন্সিলকে বায়ে রেখে আমরা কলা ভবনে ঢুকতাম । তখন আমার মেজ বোন প্রথম বর্ষের ছাত্রী । দুই পাশে শক্ত করে বেনি করে । সেটা দুলিয়ে দুলিয়ে নেমে যেত ও ।

এবার ফিরবার পালা । ওদের নামিয়ে গাড়ি সোজা চলে আসতো আমাদের সামীবাগের বাসায় । গাড়ি যখন বাড়ি পৌছতো, তখন ঘড়ির কাটা নটা ছুয়েছে । সাড়ে-সাতটার গাড়ি চার জনকে চার জায়গায় নামিয়ে নটার মধ্যে ফিরে ফিরে আসা চাট্টি খানি কথা নয় । কিন্তু তখনকার সময়ে সেটা সম্ভব ছিল ।

ঢাকার মানুষ যে কত স্বাচ্ছন্দে জীবন-যাপন করতো, সেটা নীল আকাশের নিচে সিনেমা দেখলে বোঝা যায় । সিনেমার নায়ক শহরের ট্যাক্সি ড্রাইভার । ফলে শহরের অলি-গলি সব ক্যামেরায় ধরা পড়ে । কি নিটোল জ্যাম-মুক্ত ঢাকা । মনে হয় হাটখোলার মোড়ে বাড়ি ভাড়া করে থাকি ।

এখন সকাল নটা । এবার আমার আর আমার ছোট বোনের স্কুলে যাবার পালা । আমার ছোট বোন লাল রঙের জামা পড়ে কামরুন্নেসা স্কুলের দিকে রওনা হতো । স্কুলের পোশাক লাল বলে সবাইকে লাল পড়তেই হতো । সম্ভবত রিকশায় চেপে বা যতদূর মনে পড়ে কালু মিয়া ওকে স্কুলে দিয়ে আসতো । বাসা থেকে বেরিয়ে হাটখোলার ভেতর দিয়ে একটু এগুলেই কামরুন্নেসা স্কুল । হেঁটে গেলে দশ মিনিট । এই কামরুন্নেসার পাশেই আমার জন্ম হয়েছে । সে কথা পরে আবারো লিখবো ।

তখন আমি সেন্ট গ্রেগরী হাই স্কুলে পড়ি ক্লাস সিক্সে । প্রতিদিন সকাল দশটায় স্কুল বসে । সামীবাগ থেকে বেরিয়ে নারিন্দার ভেতর দিয়ে লক্ষ্মীবাজারে হাজির হই । লক্ষ্মীবাজার হলো পুরোনা ঢাকার একেবারে কেন্দ্র-বিন্দুতে । ঢাকার মূল কর্মকান্ড আবর্তিত হতো এই লক্ষ্মীবাজারকে ঘিরে । এই লক্ষ্মীবাজারেই দাঁড়িয়ে আছে সেন্ট গ্রেগরী হাই স্কুল ।

তখন লম্বা-লম্বা পাদ্রি সাহেবরা আমাদের পড়ান । ছয় ফুটের নিচে না উনাদের উচ্চতা । আমারদের গলা উচিয়ে কথা বলতে হতো । মাঝে-মধ্যে দেখতাম উনারাও ঝুকে পড়েছে আমাদের কথা শুনতে । পাদ্রি সাহেবদের পাশাপাশি হিন্দু-মুসলিম শিক্ষকরাও আমাদের পড়াতেন । শিক্ষকদের অনেকেই আজ বেঁচে নেই । উনাদের কথা মনে হলে চোখে পানি চলে আসে ।

আব্বা বের হতেন সকাল দশটায় । আব্বার তখন নারায়নগঞ্জে রঙের ব্যবসা । শীতলক্ষ্যার পাড়ে আব্বার অফিস । সবাইকে নামিয়ে গাড়ি ফিরে এলে আব্বা সওয়ার হতেন, তারপর সোজা নারায়নগন্জ । শুরু হলো আব্বার দিন ।

আমার বা আমার ছোট বোনের স্কুল কাছে বলে আমরা সাধারণত রিকশায় যাতায়াত করতাম । তবে মাঝে-মধ্যে বাড়ির গাড়ি আমাদের পৌছে দিত ।

সবার শেষে আসি আমার ছোট ভাইয়ের কথা । ও আমার দশ বছরের ছোট । হঠাৎ করে ও আমাদের অনেক ছোট । আব্বা-আম্মার শেষ বয়েসের সন্তান, যাকে আমরা বলি কোলের ছেলে । কোলের ছেলে তখনও সেন্ট গ্রেগরীতে ভর্তি হয়েছে কিনা মনে আনতে পারছি না । তবে যতদূর মনে পড়ে, হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে ও হেঁটে বেড়ায় ঘরময় আর আমরা ভাই-বোনরা সেটা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি ।

যেভাবে দিন শেষ হতো

জোহরের পর থেকে শুরু হতো ফেরবার পালা বিশেষত বড় চারজনের, যারা সকাল-সকাল বেরিয়ে গেছে । কে আগে ফিরবে, তা বলা শক্ত ছিল । মা সব কিছু গরম করে বসে থাকতো যেন ছেলে-মেয়েরা গরম গরম খেতে পারে । তখন আমাদের বাসায় মাইক্রোওয়েভ ছিল না । মাকে দেখতাম কেরোসিন বা লাকড়ির চুলায় রান্না করতে কারণ তখনো গ্যাস আসেনি ।

জোহরের পর থেকে সন্ধ্যের মধ্যে একে একে সবাই চলে আসতো । আমাদের মা প্রতিবারি সব গরম করতেন । ছেলে-মেয়েদের ঠান্ডা ভাত ছুতেও দিতেন না তিনি । কিন্তু এই যে প্রতিবার গরম করা, এই যে সাত ছেলে-মেয়েকে কাছে নিয়ে খাওয়ানো, সেজন্য মাকে কখনো মন ভার করতে দেখিনি । পরম উৎসাহে মা আমাদের সেবা করে যেতেন সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি ।

সবার শেষে আসতো আব্বা । আব্বার ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যেত । আব্বার খাওয়া হলে মা শুয়ে পড়তেন । মা ঘুমিয়ে যেতেন সবার আগে কারণ তাকে উঠতে হবে ফজরের আগে । তারপর শুরু হবে খোদা-পাগল করা গুন-গুনে গান ।

শেষ

Chapter Two from the book *Amar Chelebela* by Sayed Hossain.
Please e-mail: sayed.hossain@yahoo.com
Personal website : www.sayedhossain.com
Dallas. USA. June 21, 2011.